একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Tarapada Roy's short stories: Mirror of time

তারাপদ রায়ের ছোটোগল্প : সমকালের দর্পণ

Name of the Author: MAMPI DEBANGSHI

Affiliation: Research Scholar, Burdwan University, West Bengal;
MA from Visva-Bharati, India

Abstract: The name Tarapada Roy (1936–2007) immediately brings to mind a humourist or writer of light and witty prose. However, his literary contributions were not limited to humorous writing alone; he moved freely across the worlds of short stories, poetry, novels, travelogues, and essays. A naturally witty writer, humour appears effortlessly in his stories, and he was a skilled artist in presenting a bitter irony mixed with playful satire. He was born in Elasin village of Tangail town in British India (present-day Bangladesh). After passing the matriculation examination from Bindubasini High School in East Bengal, he moved to Kolkata in 1951. He completed his graduation in Economics from Central Calcutta College (now Maulana Azad College). For some time he worked as a teacher in a school in Habra, North 24 Parganas, and later joined government service. After leaving Bangladesh at the age of fifteen, he never lived there permanently again.

Various political, social, and economic events of his time deeply influenced both him and his writings. The devastating memories of the Second World War, the Partition of India, the refugee crisis, communal riots, and the Bangladesh Liberation War remained with him throughout his life. At different times he recalled these traumatic experiences, and evidence of this can be found in the stories written in the twenty-first century. The perspective through which a particular individual at a particular time observes one or more events or experiences is unique and irreplaceable; as time or the narrator changes, the expression of the same event also changes. The same is true in the case of Tarapada Roy.

The story "Golapi Ronger Dinguli" (The Pink-coloured Days) carries a touch of romanticism in its title, but in reality the writer portrays the poisonous days of Bengali life affected by the Second World War and the Great Famine. In the four-part story "Bholanath," the turbulent period of two world wars, the independence movement, Partition, communal riots, and the Bangladesh Liberation War is depicted; the characters Bholanath and Sangram Sen seem to stand as witnesses to how people had to struggle to survive and to keep others alive during those times. The reflection of the 1971 Liberation War can also be seen in "Kansar Gelas." Here the author weaves the story of a middle-class salaried man's lifelong dream of owning a house and the eventual shattering of that dream. Though humorous on the surface, the story contains layers of the history of a particular time.

In these stories, beneath the veil of humour, the uncertainty and insecurity of middle-class life, the humiliation of refugees, the instability of employment, shattered dreams, the small joys and sorrows of everyday life, the crowd and narrowness of urban existence, and the fearful psychology of ordinary people in the background of communal tension are clearly portrayed. The writer's own psychological tragedy of losing his "home" creates a sense of hidden pain beneath satire. Colonialism, Partition, war, dictatorship, and mass movements together shaped a complex social reality. Tarapada Roy's short stories stand as sharp and humane documents of that changing time. His writings do not contain direct political slogans; rather, they present the deep impact of socio-political realities through subtle artistic expression, revealing the underlying tragedy and irony of circumstances.

Keywords: Short story, contemporary context, Second World War, famine, Partition, communal riots, Liberation War.

তারাপদ রায়ের ছোটোগল্প : সমকালের দর্পণ

মাম্পি দেবাংশী

তারাপদ রায় (১৯৩৬ – ২০০৭) নামটি শুনলেই আমাদের মনে প্রথমেই যে শব্দ আসে তাহলে রম্যরচনাকার বা রসসাহিত্যিক। তবে শুধুমাত্র রম্যরচনা নয় ; ছোটোগল্প, কবিতা, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধের জগতেও তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। স্বভাবরসিক এই লেখকের গল্পে সাবলীলভাবেই হিউমার এসেছে, পরিহাসমিশ্রিত তিক্তরস পরিবেশনে তিনি নিপুণ শিল্পী। তাঁর জন্ম ব্রিটিশ ভারতের (অধুনা বাংলাদেশের) টাঙ্গাইল শহরের এলাসিন গ্রামে। ওপার বাংলার বিন্দুবাসিনী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ১৯৫১ সালে তারাপদ রায় কলকাতায় চলে আসেন। ১৯৩৯-৭১ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, ভারতভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনা বিশ শতকের বাংলা সমাজ মানুষের জীবন ও মানসিকতার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। নিজের জন্মভূমি ছেড়ে আসার কয়েক দশক পর তারাপদ রায় তাঁর ছোটোগল্পে ফেলে আসা সময়কে ফিরে দেখেছেন, সরাসরি ইতিহাসের ভাষায় নয়, বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবন, স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নতুনভাবে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর গল্পে ইতিহাস কোনো দূরগত বিষয় নয়, তা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অস্থিরতা, খাদ্যাভাব এবং অর্থনৈতিক সংকট তাঁর গল্পের প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। একইভাবে ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে মানুষের জীবনে যে দুর্দশার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, তা তাঁর গল্পে সহানুভূতির সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা জানি দেশভাগের ফলে অসংখ্য মানুষ তাদের জন্মভূমি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে; পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয় এবং মানুষের মনে এক গভীর বেদনা ও অনিশ্চয়তার জন্ম হয়। তারাপদ রায় এই ঘটনাকে শুধু রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে দেখেননি , এর মানবিক দিকটি তুলে ধরেছেন—মানুষের ভিটেছাড়া হওয়া, স্মৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং নতুন করে জীবনসংগ্রাম।

পঞ্চাশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও পরবর্তী সময়ে মানুষের মধ্যে ভয়, সন্দেহ ও বিভেদের যে পরিবেশ তথা সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল তা তিনি তাঁর গল্পে সংবেদনশীলভাবে তুলে ধরেছেন। আবার মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম এবং মানবিক সম্পর্কের গভীরতাকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গে। ছোটো ছোটো ঘটনা, সাধারণ মানুষ এবং দৈনন্দিন জীবনের উপকরণের মধ্য দিয়ে এই ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন, এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। তাঁর গল্পে একটি সাধারণ বস্তু, একটি পারিবারিক ঘটনা কিংবা একটি স্মৃতির পাতা থেকেও বৃহত্তর সময়ের ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ফলে তাঁর গল্পগুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সমষ্টিগত ইতিহাসের এক অনন্য মেলবন্ধন ঘটায়। তাঁর গল্পগুলো কেবল কাহিনি নয় ; ব্যক্তিগত স্মৃতি, সামাজিক বাস্তবতা এবং ইতিহাসের গভীর অভিঘাতকে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে কীভাবে নির্দিষ্ট সময়ের সমাজজীবনের দলিল অর্থাৎ সমকালের দর্পণ হয়ে উঠেছে তা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

গল্পের নাম 'গোলাপি রঙের দিনগুলি', নামের মধ্যে রোমান্টিকতা সুস্পষ্ট। লেখক কি সত্যি গোলাপি দিনের কথা বলেছেন? না। গল্পের নায়ক পতিতপাবন চক্রবর্তী , তারই ডায়েরির নামের অনুসরণে গল্পের নামকরণ করলেও গল্পকার আসলে বাঙালি জীবনের বিষাক্ত দিনগুলির ছবি এঁকেছেন । বিশাল পরিবারের মধ্যে লেখকই প্রবীণতম ব্যক্তি হিসেবে শেষ পর্যন্ত রয়ে গিয়েছিলেন। পুরনো কারও ব্যাপারে কৌতূহল হলে সেসব দিনের কথা লেখককে জিজ্ঞাসা করত সবাই কারণ এই শান্ত ছোটো মফঃস্বল শহরের এক বৃহৎ ও গোলমেলে পরিবারের স্মৃতি বহনকারী শেষতম ব্যক্তি ছিলেন তিনিই। যদিও নিজেকে বৃদ্ধ বলে মনে করতেন না; তারাপদ রায় মনে মনে ছিলেন চিরযুবক। পতিতপাবন চক্রবর্তীর মত এক অস্পষ্ট মানুষের কথা লিখতে গিয়ে গল্পকার বলেছেন-

"আমার লেখা মানে এক অস্তগত পৃথিবীর শেষ সোনালি আলোর নীচে কয়েকজন সামান্য মানুষ আর ছোটখাটো ব্যাপার। সেসব কথাও আমি গুছিয়ে লিখতে পারি না, সবকিছু কেমন যেন এলেবেলে হয়ে যায় । যা বলতে চাই বলতে পারিনা। যা দেখতে চাই দেখতে পারি না। কত কিছু ভুল হয়ে যায়। লেখা ছাপা হয়ে যাওয়ার পর দেখি কত কিছু বলা হয়নি, বাদ রয়ে গেছে।"[১]

আসলে স্মৃতি তো এরকমই এলোমেলো। খড়্গনাসা, পুরো ছয় ফুট লম্বা রোগাটে চেহারার শ্যামবর্ণ মানুষ পতিতপাবন ফটাফট ইংরেজি বলতেন, কিন্তু সেসব ইংরেজি খুব সুবিধের নয় - গুড মর্নিং, সো নাইস, অল রাইট, সরি। ইংরেজি বয়ান তার মুখে কথায় কথায় খইয়ের মতো ফুটত যা কিনা সেকালের মফঃস্বলে চমকপ্রদ ছিল। কিন্তু তাঁর সাজপোশাকের সঙ্গে এসব জালিয়াতি ইংরেজিয়ানা বেমানান ছিল । তিনি পরতেন হাঁটুর উপরে তোলা খাটো ধুতি, গায়ে ফতুয়া কিংবা কাঁধে গামছা আর পায়ে ছিল নাকতলা কাঠের খড়ম । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে তিরিশের দশকের শেষ ভাগে তিনি কাজ করতেন কলকাতায় চৌরঙ্গি আর পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে হল এন্ড অ্যান্ডারসনের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে, শিবরাম চক্রবর্তী যাকে মজা করে বলতেন হলধর এবং ইন্দ্রসেনের দোকান। সেখানে ইংরেজি বুকনি না জানলে চাকরি অসম্ভব । ফুটবলার পতিতপাবনবাবু ফুটবলের মতই গড়াতে গড়াতে কলকাতায় এসে পৌঁছে ছিলেন কিন্তু কলকাতায় খেলাধূলায় তেমন সুবিধা করতে না পারলেও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান একজন ইংরেজের সঙ্গে থেকে শেখা ইংরেজি তাঁকে পরে কোম্পানিতে কাজ পাবার সময় খুব সাহায্য করেছিল। একটা চাকরি জোটানো তখন খুব কঠিন ছিল কারণ সময়টা ছিল ঠিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী ; আমরা জানি সে সময়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব সমস্যা চরমে উঠেছে। লেখক লিখছেন –

"সেটা ছিল যুদ্ধের আগের ভয়াবহ মন্দার বাজারের যুগ । কেনাকাটা, বিক্রিবাটা প্রায় বন্ধ। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে পড়ে যাচ্ছে । জুতো একজোড়া পাঁচসিকে , ধুতি একজোড়া দেড় টাকা। নতুন ব্যবসাপত্র , চাকরি বাকরি কিছু নেই। তার ওপরে বঙ্গ প্রদেশে শাসকের দৌরাত্ম্যে সাম্প্রদায়িক বর্ণ হিন্দুর কোনও ছেলের পক্ষে সামান্য চাকরি জোগাড় করাও অসম্ভব। বিএ, এমএ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ছেলেও সাধারণ কেরানির চাকরি জোটাতে পারত না।...যুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয়নি। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা আর দেশভাগের বিষাক্ত দিনগুলি বাঙালি জীবনের

রঙ্গমঞ্চের উইংসে অপেক্ষা করছে। কেউ কিছু বুঝতে পারছে না , কেউ কিছু করতে পাচ্ছে না । শুধু মাঝেমধ্যে নিরর্থক চিৎকার শোনা যাচ্ছে, 'বন্দেমাতরম', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'আল্লা হো আকবর'।"[২]

হল এন্ড অ্যান্ডারসনে চাকরি করাকালীন জেমস সাহেব পতিতপাবনকে 'ল্যাংকি' বলে সম্বোধন করতেন। শব্দটি লক্ষণীয়, তৎকালে সাহেবরা ভারতীয় বাঙালিদের যে ভালো চোখে দেখতেন না তারই প্রমাণ পাওয়া যায় এই সম্বোধনের মধ্যে কারণ বিসদৃশ শীর্ণ দীর্ঘ লোককে হেয় অর্থে ল্যাংকি বলা হয় । দোকানে কাজ করা ছোটোখাটো বাদামী রঙের মেমসাহেব মিস রোজের সঙ্গে গভীরভাবে প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন পতিতপাবন । পতিতপাবন গ্রাম্য সন্তান ছিলেন , সম্পর্কে একটা মানসিক বাধা ছিল । পতিতপাবনের বাঙালি সহকর্মীরা এই অন্তরঙ্গতা সুনজরে দেখেনি তারা ব্যঙ্গ করে বলতো 'রোজই রোজি'। তিনি খ্রিস্টান হয়ে রোজিকে বিয়ে করবেন ভেবেছিলেন কিন্তু এই সময়ই যুদ্ধ লেগে যায় । যুদ্ধ লাগল সুদূর ইউরোপে কিন্তু সেই মহাযুদ্ধের আঁচ ভারতবর্ষে কয়েক মাসের মধ্যেই পৌঁছে যায়। প্রবীণ ব্যক্তিরা যাঁরা সেই সময়ে চল্লিশোর্ধ্ব, যাঁরা উনবিংশ শতকে জন্মেছিলেন তাঁদের সাবালকস্মৃতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধারণা অনুযায়ী তাঁরা ভেবেছিলেন আগের যুদ্ধের মত আলগা -আলগা ভাবেই পঁচিশ বছর পরের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও পেরনো যাবে। কিন্তু আমরা জানি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের নাভিশ্বাস উঠে গেছিল। দিনকাল, ধ্যানধারণা, রুচি-মূল্যবোধ সব বদলে গেছিল সেই একটি প্রলয়ঙ্করী ঐতিহাসিক ঘটনায়। যুদ্ধের খবর আসামাত্র কলকাতায় সাজ সাজ রব পড়ে যায় ইংরেজমহলে। সে সময় শিশু মহিলা এবং বৃদ্ধ বাদ দিয়ে সাহেবরা প্রায় সকলেই যুদ্ধে নাম লিখিয়েছিল । নিশ্চিন্ত গার্হস্থ্য জীবন থেকে সৈন্য ব্যারাকে ও রণাঙ্গনে চলে যাওয়াটা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু স্বাদেশিকতা এবং রণোন্মাদনা ইংরেজ রক্তে প্রবল। তাই অল্পদিনের মধ্যেই যুদ্ধ যাওয়ার হিড়িক পড়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইংরেজদের দেখাদেখি সে সময় বহু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং ভারতীয় যুদ্ধে নাম লিখিয়েছিল । অবশ্য এর একটা বড়ো কারণ ছিল সেই সময়ের বিপুল বেকারত্ব। যুদ্ধে না গেলে আর কোথাও কাজ জুটত না । লেখক বেকারত্বের ভয়ংকর সমস্যাকে এখানে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন । প্রেমিকার চলে যাবার পর পতিতপাবন একবার যুদ্ধে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন কিন্তু প্রেমের জন্য তিনি ধর্মত্যাগ করতে পারেননি, রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। গল্পে পতিতপাবন, রোজি প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে যুদ্ধের সামাজিক প্রভাব ফুটে উঠেছে , তরুণদের জীবনের স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ যুদ্ধের কারণে বদলে গেছে। মানুষের মানসিকতা, জীবনযাত্রা এবং সম্পর্ক ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যুদ্ধ অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা তৈরি করেছিল। তিরিশের দশকে কলকাতায় মেসবাড়ির একটা স্বতন্ত্র ঐতিহ্য গড়ে উঠতে দেখা যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী মতো কৃতবিদ্য লোক থাকতেন । এমনই বেনিয়াটোলা লেনের একটি মেসে পতিতপাবনের রুমমেট ছিলেন কবি ও লেখক কানাই চক্রবর্তী । সাহেবি খবরের কাগজের রীতি অনুযায়ী পতিতপাবনকে অর্থাৎ পিপিকে ক্রমাগত সাহিত্য রচনার জন্য উৎসাহিত করেন কেসি । রোজি চলে যাবার পর ভগ্নহৃদয় পিপিকে কেসি সান্ত্বনা জানান , সদুপদেশ দেন এই ধরনের প্রেমে আঘাত পাওয়ার

অভিজ্ঞতাই একজন লেখকের জীবনের সম্পদ। সেই কেসিকে একদিন মধ্যরাতে ভারতরক্ষা আইনে মেস থেকে পুলিশে তুলে নিয়ে যায়, কেসি নাকি ডালহৌসি স্কোয়ারের দক্ষিণ -পূর্ব কিনারায় কারেন্সি হাউসে আগুন লাগানোর হোতাদের মধ্যমণি এই অভিযোগে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহাযজ্ঞের সমকালে বিশ্বযুদ্ধের গরম নিঃশ্বাস কলকাতার পিঠে এসে পড়েছে, কথাকার লিখছেন –

"রাস্তায় গোরা সৈন্যের বুটের শব্দ । সূর্য ডোবার পরে ব্ল্যাক আউটের অন্ধকারে দুদিন আগের ঝলমলে শহরটাকে প্রেতপুরীর মত দেখায়। দোকানপাট সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় বন্ধ হয়ে যায় । অবশেষে জাপানিরা বোমা ফেলল কলকাতায়। খিদিরপুর আর হাতিবাগানে। সে বোমা যতটা মারাত্মক ছিল তার চেয়ে লক্ষগুণ বেশি ভীতি সঞ্চার করেছিল। লোকেরা কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে হুড়মুড় করে শহর থেকে পালাতে লাগল । পতিতপাবনও একদিন পালালেন।"[৩]

লেখকের জন্মসন ১৯৩৬ -এ পতিতপাবনের উপহার পাওয়া কোম্পানির বিলিতি ডায়েরিতে প্রথম যে তারিখ পাওয়া যায় তা হল ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসের ১৪-১৫। আমরা জানি মহামন্বন্তরের বছর সেটা। ঝরঝরে ভাষায় আবছায়া স্মৃতিচারণের তিনি নাম দিয়েছিলেন 'গোলাপি রঙের দিনগুলি'। সেই লাল ডায়েরি, তার মধ্যে সযত্নে ভাঁজ করে রাখা একটা ফিকে নীল রঙের রেশমি রুমাল। দেখা হলে পতিতবাবুকে এই জিনিসগুলো ফেরত দেওয়ারও কথা ছিল। কিন্তু সেই কলকাতা শহরে গত পঞ্চাশ বছর ধরে সাত ঘাটের জল খেয়ে বেড়াতে হয়েছে লেখককে। প্রশ্ন ওঠে হঠাৎ এতদিন পরে পতিতপাবনের কথা কেন মনে পড়ল লেখকের? পতিতপাবনবাবু ছিলেন তাঁদের বাড়ির নিতান্ত সাধারণ কর্মচারী , তাঁর কাজ ছিল বেশ গোলমেলে , প্রত্যেক রবিবার দুপুরে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় বারোটার সময় কাছারি ঘরের বড়ো দেয়াল ঘড়িতে দম দিতেন কারণ তাঁর ধারণা ছিল ঠিক বারোটায় দম না দিলে ঘড়িরও বারোটা বেজে যাবে । পরবর্তীতে তিনি তাঁর বিকশিত প্রতিভা নিয়ে সাক্ষী পড়ানোর কাজ করতেন। আসলে লেখকের কলমে যখন কোনো লেখা খেলছে না তখন তিনি শরণাপন্ন হন পতিতপাবনের। তাঁর ডায়েরি লেখা পড়ে বুঝতে পারেন গোলাপি রঙের দিনগুলো হল রোজির সঙ্গে দিনগুলো , ছোটো মেয়েলি রুমালটা রোজির স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন তিনি । ১৯৫০ সালে দাঙ্গার কারণে পতিতপাবন কলকাতা এসেছিলেন, দাঙ্গার ভয়ে আর ফেরা হয়নি , তাঁর কোনো খবরও পাওয়া যায়নি। আসলে সেই সাংঘাতিক সময়ে কেউ কারো খোঁজ-খবর নিতে পারেনি, নেওয়া সম্ভবও ছিল না। ডায়েরি খুলে পড়বার সময় অন্যমনস্কভাবে রেশমি রুমালটা নাকের কাছে ধরতেই অতি দূর অতি ক্ষীণ সুগন্ধ নাকে এসে লাগে, হারিয়ে গিয়েও না হারানো খুব চেনা একটা সুগন্ধ। সমকালীন ভয়ঙ্কর ইতিহাসের অভিজ্ঞতার মাঝে সেই রেশমি রুমালের ক্ষীণ সৌরভটুকু হারাতে চাননি লেখক, যত্ন করে তুলে রেখেছেন। গল্পে সরাসরি যুদ্ধের বর্ণনা না থাকলেও সাধারণ মানুষের জীবনে যুদ্ধের কী প্রভাব পড়েছিল তা স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। ইংরেজ সরকারের সামরিক প্রস্তুতি, সৈন্য নিয়োগ , তরুণদের সেনাবাহিনীতে যোগ , শহরে ব্ল্যাকআউট, বোমা হামলার ভয় এবং যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কথাও

ইঙ্গিতভাবে এসেছে। গল্পে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে তা যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

চারটি পরিচ্ছেদে লেখা 'ভোলানাথ' গল্পে সংগ্রাম সেন ও তাঁর গৃহদেবতা উপলক্ষ হলেও লক্ষ্য হল সমকালীন ভয়াবহ সময় এবং সংঘর্ষের ছবি পরিস্ফুট করা । গল্পের প্রধান চরিত্র সংগ্রাম - এই চরিত্রনামের মধ্য দিয়ে লেখক এক ভয়ংকর সময়ের প্রতি ইঙ্গিত রেখেছেন । দুই বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন , দেশভাগ, দাঙ্গা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ - এই উত্তাল কালপর্বে মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য , বাঁচিয়ে রাখার জন্য কীভাবে লড়াই করতে হয়েছে ভোলানাথ যেন তারই সাক্ষী হয়ে রয়েছেন এই গল্পে । গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র বিশ্বপ্রিয় ও অনুশীলার মধ্যে দিয়ে কলকাতার মানুষের চোখে গ্রামীণ সৌন্দর্যকে দেখা হয়েছে , ধু ধু প্রান্তর কিংবা নির্জন নদীর ঘাট যেখানে এক ঝাঁক গাংশালিক ধুলোবালির উপর গড়াগড়ি খেয়ে পাখায় ধুলো মাখে , নবীন ধানের মঞ্জুরী ছুঁয়ে আলপথ চলে যায় দিগন্তে , ভিন্ন জগতের দিকে । বিবেকনগর বাসস্টপে নামার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রিয় এক অন্য হেমন্তের সন্ধান পেল , যা কলকাতায় বসে কোনোদিন অনুভব করা যায়নি । সরষে ক্ষেত, আখের ক্ষেত , ধান ক্ষেতের পাশে ছোটো শহরের মতন জায়গা বিবেকনগর , দেশভাগ হওয়ার পরে পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুরা যেখানেই ফাঁকা জায়গা পেয়েছে কলোনি তৈরি করেছে, বলা হত রিফিউজি কলোনি। আসলে

"উদ্বাস্তু হওয়া মানে শুধু স্থানচ্যুতি নয়, নিজের পরিচয় ও শিকড় হারানোর বেদনা।"[৪]

দেশভাগের পঞ্চাশ বছর পর শব্দ দুটো উড়ে গেছে , সেই রিফিউজিও নেই কলোনিও নেই । সব উদ্বাস্তু জনপদ ধীরে ধীরে গ্রাম বা শহরের আকার ধারণ করেছে। বাঘাযতীন, অশোকনগর, বিবেকনগর এগুলোকে আর বাস্তুহারা আর রিফিউজি কলোনি বলা চলে না কারণ এই সময়পর্বে একটা প্রজন্ম শেষ হয়ে গেছে। লেখকের মত ওপার বাংলা থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদেরকে তখন আর রিফিউজি বলা হত না । বিশ্বপ্রিয় বিবেকনগরের পাশে কালীপুর গ্রামে সংগ্রাম জ্যাঠার কাছে। এই সংগ্রাম সেন ওরফে সংলাপ কবিরাজের জীবনবৃত্তান্তের মাধ্যমে লেখক এক দীর্ঘ সময়কে ধরে দিয়েছেন , বিশেষ করে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের খুঁটিনাটি ইতিহাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর জন্ম, দুর্ধর্ষ জার্মান রণতরি এমডেন জাহাজের অনুসরণে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল , বরেন্দ্রবঙ্গীয় উচ্চারণে যা দাঁড়ায় মদেন। তারপর বহু সময় চলে গেছে এখানে লেখক প্রকৃতির সঙ্গে সময়ের একটা বৈপরীত্য দেখিয়েছেন –

> "অপরাজিতা কিংবা কাঠচাঁপা কিংবা তেমন কোনো ফুলেরই রঙ একটুও বদলায়নি । ঝরা বকুলের কিংবা ফোটা গোলাপের সৌরভ এখনও একই রকম আছে । দেশ-কাল বদলে গেছে। কিন্তু এখনও বৈশাখ মাসে হঠাৎ বিকেলবেলার আকাশ অন্ধকার করে ঝড় আসে । শীতকালে উত্তরের ঠান্ডা বাতাস সব কিছু এলোমেলো করে দেয়। মনের মধ্যেও সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়।"[৫]

আসলে লেখক কিংবা সংগ্রাম সেন এদের জীবন ভবিষ্যৎ বারবার এলোমেলো হয়ে গেছে সময়ের ধাক্কায়, দেশ-কালের পরিবর্তনে । দেশভাগের সময় কোনোরকমে ওপার বাংলায় থাকলেও বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়

খানসেনাদের অত্যাচারে আর সেখানে থাকতে পারেননি সংগ্রাম সেন । ওই সময় মধ্যযুগের বর্বরতা ফিরে এসেছিল। মিলিটারিরা জিপে করে পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ত , পুরুষ মানুষ ও যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যেত । তাই সপরিবারে সংগ্রাম ভিন্ন গ্রামে খোলা আকাশের নীচে নলখাগড়ার ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। কথাকার মুক্তিযুদ্ধের সেই ভয়ংকর সময়ের কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন – "চারিদিকে চরম বিশৃঙ্খলা। আইন-আদালত, থানা-পুলিশ বলে কিছু নেই। বাজা- হাট প্রায় বন্ধ, হঠাৎ হঠাৎ খোলে, খুললেও কোনো জিনিস পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও সাংঘাতিক দাম। স্কুল, কাছারি, ব্যাঙ্ক সব অনিশ্চিত। রাস্তায় লোকজন নেই, যারা বিশেষ প্রয়োজনে বেরিয়েছে, তাদের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ।

"প্রথম দিকে মুক্তিফৌজের জয়জয়কার শোনা গিয়েছিলো । একটার পর একটা জেলা স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশের নতুন পতাকা ওড়াতে লাগলো।

কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের অবসান হলো । বর্বর ও নিষ্ঠুর সামরিক শক্তির সঙ্গে , আধুনিক অস্ত্রের সঙ্গে সম্মুখ সমরে লাঠি , বল্লম, জয়বাংলা বিপর্যস্ত হয়ে গেলো । তখন শুরু হলো চোরাগোপ্তা গেরিলা লড়াই, সেটাই আসল যুদ্ধ।"[৬]

এর পাশাপাশি সেই সময়ে চরমে উঠে ছিল রাজাকারদের অত্যাচার । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজাকার ছিল মিলিটারিদের স্থানীয় সহযোগী , যুদ্ধের সময় এরা মানুষের সঙ্গে যে নৃশংস ব্যবহার করেছিল তা কল্পনাতীত । পিতৃমাতৃহীন দুই অপোগণ্ড ভাই, বুড়ি মা ও স্ত্রীকে নিয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় মাঠেঘাটে ছোটাছুটি করার পর সংগ্রাম সেন সিদ্ধান্ত নেন ভারতে চলে আসার। কিন্তু একাত্তর সালের মে মাসে যে স্টেশন হয়ে ভারত সীমান্তে পৌঁছানো যায় সেই ঈশ্বরদি স্টেশনে সম্পূর্ণ অরাজক অবস্থা । পুরো স্টেশন পাকসৈন্য ও রাজাকারদের দখলে । সংগ্রাম নিজের ও ভাগ্নেদের জন্য লুঙ্গি এবং মা ও স্ত্রীর জন্য বোরখা সংগ্রহ করে। এখান থেকে বোঝা যায় কীভাবে একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের ওপর আক্রমণ নেমে আসছে । পাকিস্তানিদের মূল কোপটা হিন্দুদের উপরে এসে পড়েছিল। তাই মে মাসের শেষের দিকে হিন্দু গৃহস্থরা আর মুক্তিফৌজের উপর আস্থা রাখতে পারেনি , গল্পে আমরা সেই ছবিই দেখতে পাই –

"দলে দলে লোক গৃহত্যাগ করে ভারতের দিকে রওনা হতে লাগলো । মোটামুটি হাটবাজার শহর এড়িয়ে নৌকোয় পদ্মা পেরিয়ে আখ ক্ষেত , পাট ক্ষেত আর ছোট ছোট গাঁয়ের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে লোকেরা সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে রওনা হলো । মিলিটারির ভয়, রাজাকারের উৎপাত, লুটপাট, ধর্ষণ অনেক কষ্ট ছিলো সেই শখের যাত্রায়।"[৭]

এমনই এক উদ্বাস্তু দলের সঙ্গে সংগ্রামকুমার বাড়ির লোকের সঙ্গে এসে পৌঁছলেন নদীয়া জেলার মেহেরপুরে। মনে রাখতে হবে মেহেরপুর আমবাগানে তখন বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধাদের বড় ঘাঁটি , জায়গার নতুন নামকরণ হয়েছে মুজিবনগর , স্বাধীন বাংলার রাজধানী । চলে আসার আগের দিন রাতের অন্ধকারে পাবনার

বাড়িতে গিয়ে উঠোনের একপাশে পুরনো পাতকুয়োর মধ্যে বাসন-কোসন আর গৃহদেবতা ভোলানাথের মূর্তি ফেলে দিয়ে আসেন সংগ্রাম। সেখান থেকে বিবেকনগরের এক রিফিউজি কলোনিতে সরকারি অনুদানে ঘর করে বসবাস শুরু করেন। ভিটেমাটি ছেড়ে আসার দুঃখে সংগ্রামের মা দিনরাত ভোলানাথের নাম ধরে কাঁদতেন। মায়ের গলার সোনার হার বিক্রি করে নতুন ভোলানাথের মূর্তি এনে দেন সংগ্রাম। ১৯৭১-এর ঠিক ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বাংলাদেশ স্বাধীন হয়, আবার জয়বাংলা, আবার জেলায় জেলায়, ঢাকায়, ময়মনসিংহে, পাবনায় নতুন পতাকা। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পাবনায় ফিরে যান সংগ্রাম, কুয়ো ছেঁচে বাসনপত্রসমেত ভোলানাথকে উদ্ধার করেন। কিন্তু এলোমেলো চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ দেশে ফিরে তিনি বুঝলেন মাতৃভূমির প্রতি সত্যিকারের টান চলে গেছে, দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু হওয়ার জন্য মনস্থির করে করে ফেলেন। দেশভাগের দুই দশক পেরিয়েও কেন মানুষকে বারবার ছিন্নমূল হতে হয়েছে, ভিটেমাটিহারা উদ্বাস্তু হতে হয়েছে- সেই প্রশ্ন বারবার জোরালো হয়েছে এ গল্পে। একমাসের মধ্যে পাবনার বাড়িঘর জমিজিরেত সব বিক্রি করে পাকাপাকিভাবে কালীপুরে ভাগ্নেদের নিয়ে নতুন আবাস গোছানোয় মন দেন সংগ্রাম সেন। প্রথম যৌবনে তাঁর নিজের কবিরাজি ব্যবসার ভালো পসার ছিল কিন্তু দেশভাগ হওয়ার পর পাকিস্তানে হেকিমি চিকিৎসা বেড়ে যাওয়ায় তাঁর কবিরাজি ব্যবসার কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয়। আলিপুরে এসে নতুন করে তিনি আবার সেই ব্যবসা শুরু করেন। নানা দুষ্প্রাপ্য প্রয়োজনীয় গাছ-গাছালিতে ভরে ওঠে তাঁর বাড়ি, ছোট ভাগ্নে এবং তার বৌ সংগ্রামবাবুর প্রধান সহায়ক। ভোলানাথের সুদিন ফিরে আসে, মোজাইকের মেঝে আর রঙিন টাইলসের মন্দিরে ভাগ্নে বউ অমলা তাঁর খুব যত্ন করে।

তৃতীয় অধ্যায় 'ভোলা বাবা পার করেগা'-র শুরুতে সংগ্রামের বাড়ির মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন –

"সারাদিন প্রশান্ত বাতাস
ফেলিতেছে মর্মর নিঃশ্বাস,
বনের বুকের আন্দোলনে
কাঁপিতেছে পল্লব-অঞ্চল।"[৮]

এই প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে গল্পকার এঁকেছেন অমলা চরিত্রটিকে, যার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে গ্রাম বাংলার সনাতন সধবার চিরন্তন রূপ। রুপে লাবণ্যে যত্নে আতিথেয়তায় অমলা চরিত্রটি সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ঠিক এর বিপরীতে এঁকেছেন শহুরে আধুনিকা অনুশীলা চরিত্রটিকে, বিশ্বপ্রিয়র সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে এই চরিত্রটির ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরেছেন লেখক। এদের পাশাপাশি এই অধ্যায়ের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তারিণীকুমার সেন, সম্পর্কে সংগ্রাম সেনের ফুলকাকা। এখানে ফুলকাকা, হাফকাকা, ডবলকাকা নিয়ে হাসির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। তারপরেই আবার গল্পের মোড় ঘুরে গেছে। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় সংগ্রাম যখন একবস্ত্রে দেশ ছেড়ে এসে অসহ্য কষ্ট করে ভাইপোদের কাছে উঠেছিলেন তখন তারিণীকুমার সামান্য খোঁজ

খবরও নেননি। অথচ তিনি অনেক আগে কলকাতায় এসেছেন , আলিপুর আদালতে তাঁর রমরমা পসার , ইচ্ছে করলে অর্থ সাহায্য করতে পারতেন কিন্তু তা করেননি , কোনো খোঁজই নেননি। সংগ্রাম ও তারিণীকুমারের মধ্য দিয়ে কালের বেড়াজালে আটকে পড়া মানুষের দুর্গতি ও সুবিধাবাদী মানুষের স্বার্থপরিপূর্ণ নীচ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। দীর্ঘ ঋজু চেহারার ধবধবে ফর্সা সংগ্রাম সেন বয়সের ভারে একটু নুয়ে গেলেও নিজের মূল্যবোধকে কখনো বিসর্জন দেননি। জাতি-কুলশীল সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সংকীর্ণমনা হলেও তাঁর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সুশিক্ষার উদাহরণ রেখে যেতে চেয়েছেন । তাই চিঠিতে তারিণীকুমারের শেষ ইচ্ছেকে সম্মান জানিয়ে বংশদেবতা আদি ভোলানাথকে বিশ্বপ্রিয়র হাতে তুলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি । প্রকাশ্য দিবালোকে পাওয়া ভোলানাথের স্বপ্নাদেশ পেয়ে অযত্নে পড়ে থাকা বিবেকনগরের সেনবাড়ি থেকে নতুন ভোলানাথকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। নতুন ভোলানাথকে যেরকম আদরে-আপ্যায়ণে আপন করে নিয়েছেন তেমনই সাবেকি ভোলানাথকে বিদায় জানাতে গিয়ে অমলার চোখে জল এসে যায় । দীর্ঘদিন সন্তানের মতন করে ভোলানাথের পরিচর্যা করেছে অমলা, দেবতার প্রতি তার অকৃত্রিম স্নেহ-বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুশীলাও ভালোবেসে নতুন ভোলানাথের নাম দেয় আলানাথ, ফেরার পথে বিশ্বপ্রিয়ের পাশে ঘন হয়ে বসে ভোলানাথকে ভালো করে জড়িয়ে ধরে কোলের মধ্যে। সংগ্রাম সেন, তারিণীকুমার, বিশ্বপ্রিয়, অনুশীলা কিংবা অমলা প্রত্যেকটি চরিত্রের মাধ্যমে লেখক সচেতনভাবে সুনিপুণ হাতে একটা বিশেষ সময়ের যন্ত্রণা ও তার থেকে উত্তরণের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ ও দাঙ্গার মতো গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবন, স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে লেখক সেই সময়ের সমাজবাস্তবতাকে প্রকাশ করেছেন।

গল্পকার তারাপদ রায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিচ্ছবি দেখিয়েছেন ‘কাঁসার গেলাস’-এ। অতীতের স্মৃতি, পারিবারিক ঐতিহ্য, সময়ের পরিবর্তনের সাক্ষী হল বিভিন্ন মানুষের হাতে ঘুরে বেড়ানো এই কাঁসার গ্লাস। বিশ শতকের বাঙালিদের মধ্যে কাঁসার গ্লাসে জল খাওয়ার লোক নেই বললেই চলে , এখনকার সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতে এই গ্লাস অব্যবহৃত। দক্ষিণীদের কাছ থেকে এই ব্যাপারটা নিঃশব্দে মধ্যবিত্ত বাঙালির অন্তঃপুরে ঢুকে গেছে । উচ্চবিত্ত মানুষের সংসারে ধাতুর বাসনের আর কোনো কদর নেই, পিতলের কলসি-তামার পঞ্চপাত্র-কাঁসার থালা-গ্লাস-বাটির জায়গা নিয়েছে পোর্সেলিনের আর চিনেমাটির বাসন , ডিনার সেট , কাচের গ্লাস। কিন্তু আমরা জানি রচনাকার মনের দিক থেকে একটু সাবেকি। ষাট-বাষট্টি বছর বয়সে মানুষ যতটা পুরোনো হয় তার থেকে একটু বেশি পুরনো তিনি, তিনি একটি কাঁসার গ্লাসে জল খেতেন। আর পাঁচটা কাঁসার ক্লাসের চেয়ে গ্লাসের চেয়ে সেটা একটু আলাদা অন্যরকম। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে যেমন খাগড়া কাঁসা -পিতলের জন্য বিখ্যাত তেমনি বাংলাদেশের কাগমারি। বাংলা ছড়ার বিন্নি ধানের খই আর কাগমারির দই এই পল্লীকে জীবন্ত করে রেখেছে । কাগমারির কাঁসারিপাড়া থেকে কেনা সেই বিশাল ও ভারি গ্লাস। কথকের বাড়িতে বলা হত আড়াই পোয়া গ্লাস, ওজন আড়াই

পোয়া আবার জল ধরে আড়াই পোয়া । পাকা শিল্পীর অলংকরণ রয়েছে সেটির গায়ে । দুপাশের চিকন লতাপাতা লম্বালম্বি উঠে গেছে, তার চূড়ায় আঙুরের গুচ্ছ, মধ্যিখানে বড়ো করে লেখা 'গিরিবালা'- লেখকের পিতামহীর নাম। গিরিবালার পৌত্র তারাপদ, ঠাকুরদার গ্লাসে নাতি জল খাবে- এটাই সহজ।

লেখকের ঠাকুরদা গ্লাসের জল এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলতেন দূষণহীন সেই পৃথিবীতে মানুষের নিঃশ্বাসে জোরই ছিল আলাদা। গল্পকার তাঁর লেখার টেবিলের পাশে জল ভর্তি গ্লাসটা রেখে দেন এবং অল্প অল্প জল খেয়ে কল্পনা ও স্মৃতির মূলে জলসিঞ্চন করেন। গ্লাসটার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাই মনে পড়ে যায় গ্লাসটাকে নিয়ে একটা জটিল গল্পের কথা , একটা বিশেষ সময়ের কথা । সময়টা ১৯৭১। লেখকের ঠাকুরদা-ঠাকুমা চলে যাবার পরও সেই পুরনো শহরে রয়ে গেছেন তাঁর বাবা-মা ও অন্যরা । শেষ প্রজন্ম কেবল কলকাতায়। মুক্তিযুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর সময়কে লিপিবদ্ধ করেছেন-

"বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় নিতান্ত প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ওপারের পুরো সংসারটা নিয়ে আমাদের কাছে চলে এলেন। কষ্টেসৃষ্টে কাটল কয়েকটা মাস । চলে আসার সময় বাবা জিনিসপত্র সমেত বাসায় কোনওরকমে একটা তালা দিয়ে বাড়ির লোকজন নিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন । তারপর যথারীতি রাজাকারেরা তালা ভেঙে সব লুট করে খাট -আলমারি, বাক্সপ্যাঁটরা, বাসনকোসন সব নিয়ে যায় । বাংলাদেশ যুদ্ধের পর বাবা বাড়ির লোকেদের নিয়ে যখন ফিরে গেলেন, আমিও তাঁদের সঙ্গে গেলাম।"[৯]

রাজাকারেরা যেসব জিনিস লুঠ করেছিল মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারদের বিভিন্ন আস্তানা ও বাড়ি থেকে তার বহুলাংশই উদ্ধার করেছিল। লুঠ হওয়া জিনিসপত্র বাড়ির লোকজনেরা গিয়ে মিলিয়ে মিলিয়ে নিয়ে এসেছিল । খাট আলমারি চেনা কঠিন নয় কিন্তু বাসন-কোসন চেনা কঠিন কথকের বাবা বসন্ত কাকাকে সঙ্গে নিয়ে জিনিসপত্র চিনে চিনে নিয়ে আসার দায়িত্ব দিয়েছিলেন । অন্যান্য দু-একটা গন্ডগোল হলেও গিরিবালা নাম লেখা গ্লাসটা যে লেখকের পরিবারের সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু গোলমাল বাঁধে ঠিক তারপর দিন । প্রতিবেশিনী অনিলা বৌদি সেই গ্লাসটির করেন মালিকানা দাবি করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই গৌণ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখক মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্বিচারে চলা হত্যাকাণ্ডকে তুলে ধরেছেন-

"অনিলা বৌদি বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় বিধবা হয়েছেন , তাঁর স্বামী গোপালদা ছিলেন নির্বিরোধ ভালমানুষ। মিলিটারিরা তাঁকে এসে একদিন তাদের ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে যায় এবং সেখানেই পরের দিন গুলি করে হত্যা করে।"[১০]

স্বভাবতই সেই অনিলা বৌদির প্রতি সকলের সমবেদনা সহানুভূতি ছিল তাই কথকের মা আর তর্কে না জড়িয়ে মুক্তিশিবির থেকে আনা গ্লাসটি নীরবে তাঁর হাতে তুলে দেন । কয়েক বছর পর যখন মার মৃত্যু হয় , কথাকার কলকাতা থেকে ছুটে গেছেন , শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হওয়ার পর কলকাতায় ফেরার আগের দিন বাড়ির বারান্দায় সন্ধ্যাবেলায় বসে আছেন এমন সময় অনিলা বৌদি এসে গ্লাসটা দিয়ে যান লেখকের হাতে । দর্শনা

বর্ডারে কাস্টমসের লোককে দশ টাকা ঘুষ দিয়ে তিনি কলকাতায় নিয়ে আসেন সেই গ্লাস , সেই তখন থেকেই গ্লাসটা কথকের কাছে রয়ে গেছে, লতাপাতাবেষ্টিত 'গিরিবালা' নামটার দিকে লেখক শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, এ যেন একটা বিভীষিকাময় সময়ের নীরব সাক্ষী। একটি সাধারণ কাঁসার গেলাসকে কেন্দ্র করে রচনাকার মানুষের জীবন, স্মৃতি ও ইতিহাসকে একসূত্রে গেঁথেছেন।

তাঁর এইসব গল্পে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, পারিবারিক সম্পর্ক, স্মৃতি এবং অতি সাধারণ বস্তু বা ঘটনার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সময়ের ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। কথাশিল্পী সরাসরি রাজনৈতিক ভাষ্য বা ইতিহাসের বিশ্লেষণের পথে যাননি; বরং সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্য দিয়ে ভয়ঙ্কর সময়ের বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। 'গোলাপি রঙের দিনগুলি ', 'ভোলানাথ', 'কাঁসার গেলাস '- এই তিনটি গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থিরতা, দুর্ভিক্ষ পরবর্তী মানবিক বিপর্যয়, দেশভাগের বেদনাদায়ক বিচ্ছেদ , সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভীষিকা এবং মুক্তিযুদ্ধের বীভৎসতা মানুষের জীবনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে , মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নতুনভাবে মূল্যায়িত হয়েছে। এইসব ঘটনাকে তিনি কেবল রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হিসেবে দেখেননি; বরং মানুষের মনোজগৎ, স্মৃতি, সম্পর্ক ও জীবনসংগ্রামের আলোকে বিচার করেছেন। ফলে তাঁর গল্পে ইতিহাসের নির্মমতা যেমন উপস্থিত, তেমনি মানুষের সহমর্মিতা, টিকে থাকার ইচ্ছা এবং মানবিকতার শক্তিও প্রকাশিত হয়েছে। একটি সাধারণ বস্তু, একটি ছোট ঘটনা বা একটি পারিবারিক স্মৃতির মধ্য দিয়েও তিনি বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন , এখানেই তিনি অনন্য প্রতিভার অধিকারী। একটি বিশেষ সময়ে একজন বিশেষ মানুষ এক বা একাধিক ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন তা বিকল্পহীন , সময় বা কথক বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একই ঘটনার প্রকাশরূপও বদলে যায় । এ প্রসঙ্গে 'The New Encyclopedia Britannica' গ্রন্থে বলা হয়েছে-

"History all record composed from personal observation and experience."[১১]

তারাপদ রায়ের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি।

সুতরাং বলা যায়, তারাপদ রায় তাঁর ছোটোগল্পে কয়েক দশকের ইতিহাস—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ, দাঙ্গা এবং মুক্তিযুদ্ধের পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। মানুষের জীবন, স্মৃতি এবং মানবিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তিনি এই ঘটনাগুলির নতুনতর ব্যাখ্যা করেছেন, যাতে ব্যক্তিগত স্মৃতি ও সমষ্টিগত ইতিহাসের মেলবন্ধন ঘটেছে। তাঁর গল্পগুলি পাঠকের চোখের সামনে সেই সময়ের সমাজজীবনের সুখ-দুঃখ, অস্তিত্ব সঙ্কট ও পরিবর্তনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। তাই তারাপদ রায়ের ছোটোগল্পগুলিকে সমকালীন ইতিহাস ও সমাজবাস্তবতার এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিফলন—অর্থাৎ সমকালের দর্পণ বলা চলে।

তথ্যসূত্র:-

১. রায় তারাপদ, গল্পসমগ্র, তৃতীয় খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২৮, পৃ.৯৭
২. তদেব, পৃ.৯৮-৯৯

৩. তদেব, পৃ.১০৩
৪. বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ, দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সময়, মন্দাস পাবলিকেশন, 2014, পৃ.৮২
৫. রায় তারাপদ, গল্পসমগ্র, তৃতীয় খন্ড, পৃ.১১২
৬. তদেব, পৃ.১১৩
৭. তদেব, পৃ.১১৪
৮. তদেব, পৃ.১১৭
৯. তদেব, পৃ.১৪৮
১০. ঐ
১১. The New Encyclopedia Britannica, Volume VI, Encyclopedia Britannica Inc., The University of Chicago, U.S.A., 1981 (15th edition), P.778